আজকের কাগজ 477
তারিখ 21 SEP 1991 পৃষ্ঠা 8 কলাম 5
২৬

অভিমত

বিশ্ববিদ্যালয় ঃ শ্বাপদ ও সম্ভবা

রিয়াজ দোদুল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে, হয়তোবা বন্ধ হবার জন্যেই ! আমরা তার গৌরবগাথার অংশভাক্ হতে চেয়েছিলাম শুধু, পঙ্কিলতার নয়। কাছের অন্ধকারের দিকে পিঠ দিয়ে আমরা তাকিয়ে থাকতে চেয়েছিলাম দূরের আলোর পানে। যে আলো একদা আবুল হুসেন, আবদুল ওদুদের ' বুদ্ধির মুক্তি', 'তে উন্মীলিত হতে দেখেছি; ' ৫২, ' ৬২, ', ৬৯, ' ৭১-এ সেই আলো তারুণ্যের অনন্ত আঁকুতিকে ছুঁয়ে আরোও বিচ্ছুরিত হয়েছে। কিন্তু সে যেন বিগতকালের কোনো স্মৃতি, সুদূরের কোনো আভাস! ঐ স্মৃতিরোমন্থন অন্ধকারকে কি করে ঠেকিয়ে রাখবে? এই অন্ধকার গত বিশ বছরে জমাট বাঁধতে বাঁধতে এখন দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতে পরিণত হয়েছে। সন্ত্রাস ও হত্যা একটি সাধারণ ঘটনা। জ্ঞানচর্চা ও বসবাসের অধিকারও খুইয়েছে বিদ্যার্থীরা। বিশ্ববিদ্যার নিরাপদ চারণ ভূমি এখন এক শ্বাপদ-অরণ্য। যেখানে জীবনই নিরাপদ নয়, সেখানে শিক্ষার অমিয়ধারার নিশ্চয়তার কথা কে বলবে?

বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈরাজ্যের কারণ অনুসন্ধানে অনেকে অনেক কিছু আবিষ্কার করেছেন। তবু রাজনৈতিক কারণকেই সবাই প্রধানতম কারণ হিসেবে মেনে নিয়েছেন শেষ পর্যন্ত। এই রাজনীতি কাদের, তারা কি চায় এবং এর সঙ্গে বাংলাদেশের ভবিষ্যতের কি সম্পর্ক তা অবশ্য সবাই উন্মোচিত করতে চাননি। তবু এর রাজনৈতিক সমাধান চেয়েছেন তারা। এরমধ্যে একটা স্ববিরোধিতা আছে। যে রাজনীতি বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে তার ক্রূর-কুটিল খেলায় মত্ত, সে কেন পবিত্রতা হয়ে উঠবে? এ সম্ভব নয়। এর কৌতুকজনক প্রমাণ হচ্ছে – বর্তমানে সমস্ত রাজনৈতিক দল খাতা-কলমে-ঠোঁটে জিহ্বায় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে একাট্টা, কিন্তু সন্ত্রাস তবু জীবন্ত ! এ যে তাদের আদরের ধন, অন্যতম হাতিয়ার ! তাই যারা শুধু রাজনৈতিক সমাধানের আপাত-মধুর স্বপ্নে ডুবে রয়েছেন, তারা বাস্তববুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছেন না। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, রাজনৈতিক ঐক্যের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। বরং বেড়েছে বলা যায়। বিগতকালের যে আলোক বিচ্ছুরণের কথা স্মরণ করি, তা সম্ভব হয়েছিলো ঐক্যের কারণেই। ১৪ ফেব্রুয়ারি ও ' ৯০ -এর অভ্যুত্থানে কোনো অনৈক্যের ফল নয়। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এরশাদ আমলে এক ধরনের সর্বদলীয় ঐক্য ও সংগ্রাম 'সম্ভব ছিলো অন্ততঃদুটি কারণে, প্রথমতঃ শিক্ষাঙ্গনে এরশাদের নিতান্ত দুর্বল অবস্থান, দ্বিতীয়তঃ কিছু ব্যাপারে এরশাদের বিরুদ্ধে যাওয়া ছিলো সবারই স্বার্থানুকূল। সাম্প্রতিক কালে ঐ ধরনের কোনো শর্ত অনুপস্থিত বলেই সর্বদলীয় কোনো বিশেষ ঐক্য, বিশেষতঃ যা শক্তপোক্ত দলের কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়, সম্ভব নয়। তাহলে পথটা কি? শিক্ষক রাজনীতিক- ছাত্র- অভিভাবকদের সাবেকী ধরনের ঘন ঘন বৈঠক দিয়ে বিষয়কে একঘেঁয়ে করা যাবে শুধু, মীমাংসা করা যাবে না। ডাকসু ধরনের প্রতিষ্ঠানও যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত ক্ষুধা মেটাতে অক্ষম তা বুঝতে আর কত যুগের দরকার? অন্যদিকে সরকারি যন্ত্র, পুলিশ এসব প্রয়োজনীয় বটে, তবে একমাত্র নয়। এমনকি বর্তমান কুটিল রাজনৈতিক ভূমিতে তা প্রধানতমও নয়। কেননা সরকার-পুলিশের সমর্থনে ও সামনে এসব ঘটছে। বোঝা যায় সকলেরই স্বার্থ রয়েছে। এর নিষ্ঠুরতম দৃষ্টান্ত হলো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। ছাত্ররাজনীতি নির্ভর বাংলাদেশের রাজনীতির ল্যাবরেটরিতে ঘৃণ্য স্বার্থসমূহ পরীক্ষিত হচ্ছে। যার ফল ভোগ করছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। সরকার বলছে না তার নীরবতার কারণ, বিরোধীরা দল বলছে না কেন তারা আন্তরিক নন। বলাটা অবশ্য জরুরি নয়, কারণ মনের কথা পড়া যায়। জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-মানবিকতা চর্চার প্রয়োজন তাদের ফুরিয়েছে, প্রয়োজন শুধু বাহুবল বিস্তারের। সুতরাং আমাদের তাকাতে হবে অন্যদিকে । অযুত অযুত বিদ্যার্থীর দিকে। সারা ভবিষ্যতের অসহায় যাত্রী, তারা দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

দেশের বিচারে আমরা যে জনতার কথা বলি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ঐ অযুত সংখ্যক দূরে দাঁড়ানো ছাত্রছাত্রীই হচ্ছে সেই জনতা। তাদের সচেতনতা ও চলিষ্ণু আবেগ-অনুরাগের মূল্য অপরিসীম। কিন্তু তারা কোথায়? তাদের নিরাশা, আলস্য, ক্লান্তি এই অন্ধকারকে শক্তি জুগিয়েছে শুধু। দরকার প্রচন্ড একটা উদ্বোধন, একটা ঝাঁকুনি ঐ দূরে দাঁড়ানোদের। সচেতনতার অর্থ কেবল ভোট দানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-মানবিকতা চর্চার ক্ষেত্রে উদার ও উষ্ণ ভূমিকা ছাড়া তারা হয়ে উঠবে মৃতের-ই স্তূপ । সম্প্রতি নির্দলীয় ' শিক্ষা সংগ্রাম কমিটি' একটা প্রত্যাশার সৃষ্টি করেছে। তারা অবশ্য বলেছে যে, এ কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী বা বিকল্প নয় রাজনৈতিক দলের। প্রতিদ্বন্দ্বী না হলেও এ অবশ্যই বিকল্প এবং তা প্রত্যাশিত। এই বিকল্প ধারারই অনুপস্থিতি ঘটেছে এতোদিন। একে প্রাণসঞ্চারী ও দূরপ্লাবী করা প্রয়োজন। তরুণের ভবিষ্যৎকে প্রতিদিন মেরে ফেলা হচ্ছে। সেই মৃত্যুময়তার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন আছে কিনা তা নির্ধারিত হোক। প্রতিটি বিভাগে, হলে, বটতলায় নিয়মিত আলোচনা, বিতর্ক চলুক। সংস্কৃতির এক উদার-উদ্দাম প্লাবন ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় কোনো বীরপ্রসবিনী হবে না। এসবই হওয়া চাই মূলতঃঅরাজনৈতিক ভূমি থেকে। কারণ রাজনীতি বহু আগেই বিশ্বাসহন্তারূপে চিহ্নিত। তারা ঐ অরাজনৈতিক ভূমিকে অবশ্য, সহযোগিতা করতে পারেন নানাভাবেই , যদি সদিচ্ছা থাকে। শিক্ষকদের ভূমিকাও এখানে সুদূরপ্রসারী। তাঁদেরও প্রয়োজন একটা ঝাঁকুনির। তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন যে, আদর্শের কানাগলিতে বসে সুবিধাবাদের কতোগুলো স্যাঁতসেঁতে টাকা গুণবার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁরা আসেননি। দরিদ্র দেশে শিক্ষা কোনো বিলাসিতা বা অবসর কাটানোর বিষয় নয়; তা স্বদেশ, জাতি আর আপন সংস্কৃতিকে বুকে ধারণ করার শক্তি অর্জনেরই উৎসভূমি। বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রাণকেন্দ্র। এখানে ছাত্রছাত্রীদের প্রাণচঞ্চল ও মানবিক উপস্থিতি ছাড়া অর্থহীন এর দালান কোঠা। তারা প্রশ্ন করুক নিজেদের ও এই দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে, তারা ছিঁড়েখুঁড়ে বের করুক হতাশার বীজকে, পাপ-পঙ্কিলতা-সন্ত্রাস যাদের হাতে হাতে ঘুরছে, তাদের দিক থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নিক, ঘৃণা করুক। আর এসবই যদি সম্ভব না হয়, তাহলে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে আমরা কি করবো?

রিয়াজ দোদুল
৩১৬, ডক্টরস হোস্টেল
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ